International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)
Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 1-9
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ব্যতিক্রমী দুটি গ্রীষ্মসঙ্গীত

Dr Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The object of study of the present paper is two songs of Tagore of the sub- category grīshma (summer) of the category prakriti (nature): boishakher ei bhorer haoway and madhyadiner bijan batayane. Our study is confined to the poetical aspect of the songs; the musical aspect is excluded. We have undertaken a comparative study of the salient linguistic features of the two songs. First we have highlighted the common linguistic elements and the symmetries. In the second place we have demonstrated the points of divergence. Finally we have tried to determine the place of these two songs among the songs of summer; we have brought out the elements that distinguish these two songs from the songs of the same category.

KEY WORDS: Tagore songs, summer, linguistic features, symmetries, divergences

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গ্রীষ্ম উপপর্যায়ের দুটি গানের অন্তরঙ্গ পাঠ : বৈশাখের এই ভোরের হাওয়ায় (প্রকৃতি / ১৯) এবং মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে (প্রকৃতি / ২৩)। সাঙ্গীতিক রূপ নয়, উক্ত গানদুটির কাব্যরূপই আমাদের আলোচ্য। আমরা দুটি গানের কাব্য অবয়বের তুলনামূলক আলোচনা করব। আমরা আলোচনা করব তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য গঠক উপাদান ও নির্মিতির স্তরে গানদুটির ঐক্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দুটি গানের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করব। সবশেষে আমরা গ্রীষ্ম উপপর্যায়ের গানের মধ্যে গানদুটির স্থান নির্ণয় করব।

প্রথমে দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচেতনাবিশ্বে গ্রীষ্মঋতুর স্থান কোথায়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের ২৮৩টি গানের মধ্যে গ্রীষ্ম উপপর্যায়ের গানের সংখ্যা মাত্র ১৬ --- বর্ষা ও বসন্তের গানের সংখ্যা যেখানে যথাক্রমে ১১৪ ও ৯৬। রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের গান রচনা শুরু করেন ৫৮ বছর বয়স থেকে। [১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গ্রীষ্মঋতুকে প্রত্যক্ষ করেছেন মূলত দুটি দৃষ্টিকোন থেকে। কখনও কখনও এই ঋতুকে তিনি অনুভব করেছেন শুধুই শরীরী চেতনায়। কোন কোন গানে তাই দেখি খররৌদ্র, দুঃসহ দহনজ্বালা, সর্বত্রব্যাপী নীরস শুষ্ক কাঠিন্যের বাণীরূপায়ণ। এই পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় “দারুণ অগ্নিবাণে রে” (প্রকৃতি/১৪), “প্রখর তপনতাপে” (প্রকৃতি/ ১৮), “চক্ষে আমার তৃষ্ণা” (প্রকৃতি /২৫)। একই দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ

ঘটেছে "হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে" (প্রকৃতি / ১৩) "এসো এসো হে তৃষ্ণার জল" (প্রকৃতি / ১৩) , "শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে"(প্রকৃতি / ২১) গানগুলিতে। শেষোক্ত এই গানগুলিতে গ্রীষ্মের দহনজ্বালা, মরুময়তা থেকে মুক্তির আশ্বাস রয়েছে। এই সমস্ত গানে গ্রীষ্মের দাবদাহ, শুষ্ক কাঠিন্য প্রথাগতভাবে নেতিবাচক অনুষঙ্গবাহী।

আর এক শ্রেণির গানে কবি ইন্দ্রিয়চেতনায় উন্মোচিত গ্রীষ্মের রুক্ষ কঠিন জ্বালাময় রূপের অন্তরালে প্রত্যক্ষ করেন তার এক ভিন্নতর রূপ । যিনি মানবসংসারে দুঃখ আঘাতকে চরম আত্মিক উত্তরণের সোপানরূপে, মঙ্গলময় ঈশ্বরের পরম দানরূপে সাদরে বরণ করে নেন, সেই কবি নিসর্গসংসারে গ্রীষ্মের অগ্নিময় দহনজ্বালার অন্তরালে উন্মোচন করেন তার কল্যাণময় রুদ্রসুন্দর রূপটি। একাধিক গ্রীষ্মের গানে এই ঋতুর ধ্যানমগ্ন তপস্বীরূপ নির্মিত হয়ছে। এই শ্রেণির গানের মধ্যে আছে "এসো, এসো এসো হে বৈশাখ" (প্রকৃতি / ১৪), "বৈশাখ হে, মৌনী তাপস" (প্রকৃতি / ২০) "হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে" (প্রকৃতি / ২২), "তপস্বিনী হে ধরণী" (প্রকৃতি / ২৪), "নমো নমো হে বৈরাগী" (প্রকৃতি / ১৩) ।

আমরা দেখব আমাদের আলোচ্য গানদুটিকে পূর্বোক্ত দুটি শ্রেণির কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই দুটি গানে গ্রীষ্মের বহিরঙ্গ শুষ্ক কঠোর জ্বালাময় রূপটি অথবা তার অন্তর্লীন কল্যাণময় তাপসরূপটির কোনটিই চিত্রায়িত হয় নি।

এবার গানদুটি পরপর দেখে নেওয়া যাক। এই নিবন্ধে আমরা প্রকৃতি পর্যায়ের ১৯ নং এবং ২৩ নং গানদুটিকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় গানরূপে উল্লেখ করব।

প্রকৃতি / ১৯

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ॥
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের-প্রান্ত-ছোঁওয়া বকুলমালার গন্ধ॥
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ,
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলো কেশের স্পর্শ।
চাঁপাবনের কাঁপন-ছলে লাগে আমার বুকের তলে
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয়দোলার স্পন্দ॥[২]

প্রকৃতি / ২৩

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তি-ভরা কোন্ বেদনার মায়া স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে-মনে॥
কৈশোরে যে সলাজ কানাকানি খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায় মর্মরিছে গহন বনে বনে॥
যে নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সেই বনযূথীর বাসে উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায় গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥[৩]

ঐক্য:

এবার আমরা রূপকল্পের প্রয়োগে এবং অভিব্যক্ত অনুভূতির স্তরে গানদুটির সমান্তরালতা পর্যালোচনা করব। প্রথমে আমরা দেখব কথাবস্তুর স্তরে কোন কোন গঠক উপাদান দুটি গানেই ব্যবহৃত হয়েছে।

"হাওয়া"র উপস্থিতি প্রথম গানের শুরতে এবং কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি (আটকলিবিশিষ্ট গানের পঞ্চম কলিতে)। দ্বিতীয় গানের কেন্দ্রস্থলে (সাতকলিবিশিষ্ট গানের চতুর্থ কলিতে) দেখি শব্দদ্বিরুক্তি : হাওয়ায় হাওয়ায়। দ্বিতীয় গানে "বাতায়ন" রয়েছে আস্থায়ীর প্রথম কলিতে, প্রথম গানে অন্তরার প্রথম কলিতে। "স্বপ্নে"র আভাস প্রথম গানে অন্তরার শুরুতে এবং দ্বিতীয় গানে আস্থায়ীর শেষে। দুটি গানে প্রায় প্রতিসম অবস্থানে "মন" ; দুটি ক্ষেত্রেই এই উপস্থিতি গানের দ্বিতীয় কলিতে। সবশেষে উল্লেখ করতে হয় এই গানে "ফুল"এর রূপকল্পের ব্যবহার। দুটি গানেই আছে দুটি ফুলের উপস্থিতি। দুটি গানের সপ্তম কলিতে অর্থাৎ দুটি গানেরই আভোগে আছে "চাঁপা"। প্রথম গানের চতুর্থ কলিতে "বকুল" এবং দ্বিতীয় গানের ষষ্ঠ কলিতে "বনযূথী"।

চিত্রাকারে বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

গঠক উপাদান	প্রথম গানে কলি নং	দ্বিতীয় গানে কলি নং
হাওয়া	১, ৫	৪
বাতায়ন	৩	১
স্বপ্ন	৩	২
মন	২	২
ফুল	৪, ৭	৬, ৭

এবার উক্ত গঠক উপাদানগুলির প্রয়োগকৌশল পর্যালোচনা করা যাক। দুটি গানের কোনটিতেই হাওয়া শুধু নৈসর্গিক পটভূমি রচনা করছে না। প্রথম গানে হাওয়ায় ধ্বনিত হয় অদৃশ্য মানসীমূর্তির সুললিত চরণসম্পাত, বেজে ওঠে অনির্বচনীয় আনন্দধ্বনি ; দ্বিতীয় গানে হাওয়ায় গুঞ্জরিত ফেলে আসা কৈশোরের গোপন প্রেমের স্মৃতির অস্ফুট আভাস। দুটি গানেই গ্রীষ্মের বাতাস বহন করে আনে প্রেমের বাণী। হাওয়ার মত এই দুটি গানে ফুলের রূপকল্পের প্রয়োগও কেবল নৈসর্গিক আবহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে নয়। হৃদয়ে উৎসারিত অনুভূতি পুষ্পশোভায়, কুসুমকাননে বাতাসের আন্দোলনে মূর্ত হয়ে ওঠে ; চাঁপাবন বা যূথীবন এখানে অন্তর্লোকেরই প্রতিবিম্ব। ইন্দ্রিয়চেতনাগ্রাহ্য নিসর্গজগৎ নয়, দুটি গ্রীষ্মসঙ্গীতই আবর্তিত হয়েছে "মন"কে ঘিরে, দুটি গানেই মনের উপস্থিতি। নৈসর্গিক চিত্রকল্প নয়, এই গান দুটিতে মনের ভূমিকাই প্রধান। বাতায়নের রূপকল্পের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে হয় প্রাথমিক পাঠে দুটি গানে বাতায়নের একটা চরিত্রগত পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রথম গানের বাতায়নের ইন্দ্রিয়গ্রাহী অস্তিত্ব নেই। এই বাতায়ন বাস্তব ও স্বপ্নের, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখাটি চিহ্নিত করছে। দ্বিতীয় গানে এই বাতায়ন ইন্দ্রিয়গ্রাহী বাস্তবের অঙ্গ। তবে ভিন্নতর পাঠও সম্ভব। এই বাতায়নকে বর্তমান বাস্তব ও অতীতের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলে ব্যাখ্যা করা যায়। তেমন ব্যাখ্যাও অযৌক্তিক নয়। এ সেই বাতায়নপথ যে পথ দিয়ে অতিক্রান্ত কৈশোরের বিস্মৃত ভাবনা আবার এসে ধরা দেয় আজ জীবনের মধ্যভাগে --- "মধ্যদিন"কে জীবনের মধ্যভাগ বা মধ্যবয়স বলে ভাবা যেতে পারে। সেই পাঠ অনুসারে "বাতায়ন" দুটি গানে একই অনুষঙ্গবাহী।

স্বাতন্ত্র্য:

এবার আমরা একই মর্মবস্তুর উপর নির্মিত গানদুটির স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরব।

কালগত পটভূমির জন্য বৎসরের একই সময়কে নির্বাচন করলেও দুটি গানে কবি এই গ্রীষ্মের দিনেরই দুটি ভিন্ন মুহূর্তকে নির্বাচন করেছেন। প্রথম গানে "ভোর", দ্বিতীয় গানে "মধ্যদিন"। গানদুটির শুরুতেই এই বৈপরীত্য ধরা পড়ে।

উভয় গানে কালগত পটভূমিতে দৃশ্যান্তর ঘটে --- বর্তমান বাস্তবতা থেকে অতীতে স্বপ্নপ্রয়াণ। কিন্তু বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় বর্তমান ও অতীত পরিমণ্ডলের নির্মাণকৌশলে । প্রথম গানে উপস্থাপিত বর্তমান বাস্তবের পটভূমি বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময় : বৈশাখ। অন্যদিকে যে অতীতে প্রত্যাবর্তন ঘটছে তা জীবনের সুনির্দিষ্ট কোন অধ্যায় নয় : "আরেক দিনের প্রভাত"। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গানে দেখা যাচ্ছে সেই বর্তমান বাস্তবের পটভূমি বৎসরের নির্দিষ্ট কোন সময় নয় : সুস্পষ্ট কোন মাসের নাম এই গানে ব্যবহৃত হয় নি, কেবলমাত্র "তপ্ত হাওয়া"র মধ্য দিয়েই গ্রীষ্মের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কিন্তু এই গানে অতীতচারিতার অভিমুখ জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট পর্ব : "কৈশোর"। এছাড়া দ্বিতীয় গানে বর্তমান ও অতীতের বৈপরীত্য বহুগুণে স্পষ্টতর। বস্তুত প্রথম গানে অতীতের স্পষ্ট উদ্ভাস কেবলমাত্র আভোগে : "আর এক দিনের প্রভাত"। সুনির্দিষ্টভাবে অতীতকালদ্যোতক আর কোন শব্দ এই গানে ব্যবহৃত হয় নি। অবশ্য "সেই চরণ" বা "সেই এলো কেশ" শব্দবন্ধে অনুপস্থিতিদ্যোতক "সেই" হয়তো বর্তমান বাস্তবতা থেকে দূরত্বের ইঙ্গিত দিতে পারে (অর্থাৎ যে চরণের বা কেশের কালগত অবস্থান ছিল অতীতে)। কিন্তু এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। চরণ বা কেশের অবস্থান বর্তমান বাস্তবেও হতে পারে ; এই দূরত্ব কেবল স্থানগতও হতে পারে। এই গানে কোথাও কোন ক্রিয়ার অতীত কালরূপ ব্যবহৃত হয় নি ; গানের প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণ বর্তমানে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গানে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানকালদ্যোতক "আজ" এবং প্রতিবারই তার বিপরীতে রয়েছে ক্রিয়ার অতীতকাল ("খুঁজেছিল" "ডুবে ছিল") এবং সেইসঙ্গে জীবনের অতীত পর্বদ্যোতক "কৈশোর"। প্রথম গানে আছে স্মৃতির চকিত আভাস, দ্বিতীয় গানে গভীর স্মৃতিমেদুরতা।

পরবর্তী পার্থক্য প্রেমের চিত্রায়ণশৈলীতে। দ্বিতীয় গানে "প্রেম" শব্দটির সুস্পষ্ট উপস্থিতি, অন্যদিকে প্রথম গানে কোথাও এই শব্দটি বা সমার্থক কোন শব্দের ব্যবহার ঘটে নি। কিন্তু প্রথম গানে প্রেমমূর্তি নির্মাণের একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস চোখে পড়ে। এই গানে দেখা যাচ্ছে আস্থায়ীর শেষে "চরণ", তারপর অন্তরা ও সঞ্চারীর শেষে প্রায় প্রতিসম অবস্থানে যথাক্রমে "বকুলমালা" (তার আড়ালে কণ্ঠের আভাস পাওয়া যায়) এবং "উড়ে পড়া কালো কেশ"। চরণ থেকে কেশ --- যেন শরীরী এক অবয়ব চকিত আভাসে ধরা দিয়ে যায় গানের প্রথম তিন তুকে। তারপর আভোগে আসে "হৃদয়দোলার স্পন্দন"। সদ্যোনির্মিত সেই প্রতিমায় যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আস্থায়ী ও আভোগে উত্তমপুরুষের সম্বন্ধপদের ব্যবহার এই প্রেমমূর্তি ঘিরে কবির সুস্পষ্ট উপস্থিতি নির্দেশ করে : সেই চরণের ছন্দ আসে "আমার" মনে, হৃদয়দোলার স্পন্দন এসে লাগে "আমার" বুকের তলে। অন্যদিকে দ্বিতীয় গানে উত্তমপুরুষ অনুপস্থিত। প্রেমের পাত্রপাত্রীরা সম্পূর্ণভাবেই অন্তরালে রয়ে যায়। কোথাও সামান্যতম কোন শরীরী আভাস মেলে না। ফেলে আসা কৈশোরের সেই দিনগুলির প্রকাশবিহ্বল অর্ধোচ্চারিত বাণীর রেশটুকুই সমস্ত গান জুড়ে থেকে যায়।

দুটি গানেই সঞ্চারিত হৃদয়ানুভূতিতে দুটি ভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার অনুষঙ্গ আরোপ করা হয়েছে। প্রথম গানে স্পর্শের প্রাধান্য, দ্বিতীয় গানে ধ্বনির। প্রথম গানে বকুলমালার গন্ধের স্মৃতি আধো ঘুমের প্রান্তসীমানা "ছুঁয়ে যায়" আর বাতাস যেন বহন করে আনে কালো কেশের "স্পর্শ"। "ছোঁওয়া" এবং "স্পর্শ" দুটি বিশেষ্য ছাড়াও আভোগে আছে স্পর্শদ্যোতক ক্রিয়া "লাগা" : আর এক প্রভাতের হৃদয় আজ কবির বক্ষতলে এসে "লাগে"। দ্বিতীয় গানে আজকের আবেশবিভোর মুহূর্তের উৎস কৈশোরের কানাকানি। অতীতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত সেই ধ্বনি নিসর্গলোকে পরিব্যাপ্ত হয়। গহন বনে শোনা যায় সেই মর্মর ধনি (মর্মরিছে), আর চাঁপার বনে গুঞ্জরণধ্বনি (গুঞ্জরিয়া ওঠে) ।

আমরা দেখেছি এই দুটি গানে চিত্রিত নৈসর্গিক পরিমণ্ডল মানবহৃদয়েরই প্রতিবিম্ব। তবু তুলনামূলক আলোচনায় মনোলোক ও বহির্লোকের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্নে দুটি গানের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়ে। অন্তর্লোকের আপেক্ষিক গুরুত্ব সামান্য হলেও প্রথম গানে বেশি। দ্বিতীয় গানে অন্তরার শেষে দেখি নৈসর্গিক দৃশ্যকল্পের বিস্তার --- তার প্রতিফলন এই তুকের শেষ কলিতে শব্দিদ্বিরুক্তিতে --- তপ্ত বাতাসে বিস্মৃত প্রেমের বাণী মর্মরিত হয় "বনে বনে"। প্রথম গানে অন্তরা পর্যন্ত বৈশাখী বাতাস ছাড়া আর কোন নৈসর্গিক রূপকল্প নেই। অন্তরার শেষে আছে

বকুলমালা, বকুলবন নয়। দ্বিতীয় গানে আভোগে আছে ---- যূথীবন এবং চাঁপাবন। যদিও প্রথম গানের মত দ্বিতীয় গানের আভোগে "বন" শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, তবুও এখানে ফুলবনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এখানে হৃদয়ের অবরুদ্ধ অনুভূতি চাঁপাবন জুড়ে গুঞ্জরিত হয়। কিন্তু প্রথম গানের এই অংশে অপহ্নুতি অলঙ্কারের প্রয়োগে ("ছল" শব্দের ব্যবহারে) চাঁপাবনে প্রভাতবাতাসের আন্দোলন সম্পূর্ণভাবেই মানবহৃদয়স্পন্দনের বহিঃপ্রক্ষেপ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় গানের মত নৈসর্গিক পরিমণ্ডলরূপে চাঁপাবনের যেন আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না।

দুটি গানের প্রধান পার্থক্য অভিব্যক্ত অনুভূতির স্তরে। দুই গানে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভূতির প্রকাশ। প্রথম গানে আছে 'হর্ষ" আর দ্বিতীয় গানে "বেদনা'। দ্বিতীয় গানে হৃদয়ানুভূতির বিস্তার দীর্ঘতর। বর্তমানের "বেদনা"র পর আসে হারানো দিনের "নৈরাশা" "গভীর অশ্রু"।

অভিনবত্ব:

গ্রীষ্ম উপপর্যায়ের গানগুলির মধ্যে আলোচ্য গানদুটির স্থান অনন্য। গানদুটির কোনটিতেই গ্রীষ্মের পরিচিত রূপকল্পগুলির বিস্তার নেই। গ্রীষ্মসঙ্গীতরূপে গানদুটির শ্রেণিবিন্যাসের একমাত্র ভিত্তি প্রথম গানে দুবার "বৈশাখ" নামটির ব্যবহার, দ্বিতীয়টিতে শুধুমাত্র একবার "তপ্ত হাওয়া"র উপস্থিতি। গ্রীষ্ম এই দুটি গানে শুধুই পটভূমি : প্রেমের পটভূমি। বস্তুত গানদুটিকে প্রেমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গীতবিতানে তাদের শ্রেণিবিন্যাস জানা না থাকলে, স্বতঃস্ফূর্ত পাঠে গানদুটিকে গ্রীষ্মসঙ্গীত বলে চিহ্নিত করা কঠিন হোত। কাব্যে চিরাচরিতভাবে প্রেমের পটভূমি বর্ষা অথবা বসন্ত। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রেমের কাব্যে গ্রীষ্মঋতু ব্রাত্য। প্রেমের নৈসর্গিক পরিমণ্ডলরূপে গ্রীষ্মঋতুর নির্বাচন গানদুটির প্রধান অভিনবত্ব। দুটি গানের একটিতে প্রেমের হর্ষ, অন্যটিতে প্রেমের বেদনা, একটিতে চকিত শরীরী আভাস, অন্যটিতে সম্পূর্ণ অশরীরী প্রেমপ্রতিমা নির্মাণ --- সংখ্যার বিচারে মাত্র দুই হলেও এই দুটি গ্রীষ্মসঙ্গীতের একত্র পাঠে প্রেম প্রায় তার পরিপূর্ণতায় দেখা দেয়।

প্রথম গানে তবু প্রেমের মায়াজালরচনার উপযোগী আবহ রয়েছে। এই গানে কোথাও নীরস রুক্ষতার বা দহনজ্বালার লেশমাত্র নেই। গ্রীষ্মের দিনের যে মুহূর্তটি কবি নির্বাচন করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রীষ্মের ভাবনায় সাধারণভাবে মধ্যাহ্নবেলার কথাই মনে আসে কারণ দিনের এই সময়ই গ্রীষ্মকে আমরা প্রত্যক্ষ করি স্বমহিমায়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যারও গুরুত্ব রয়েছে ; তপ্তদিনের শেষে সন্ধ্যা আসে যন্ত্রণামুক্তির আশ্বাস হয়ে। গ্রীষ্মের রূপবর্ণনায় কাব্যে মধ্যাহ্নের অগ্নিময় রূপ ছাড়া আসে গ্রীষ্মসন্ধ্যার কালবৈশাখী। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রভাত তেমন ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, যেহেতু দিনের এই সময়ে এই ঋতুকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবি প্রেমের অনুকূল পটভূমি নির্মাণের লক্ষ্যে গ্রীষ্মের এই ব্যতিক্রমী মুহূর্তকে বেছে নিয়েছেন। দ্বিতীয় গানে কিন্তু মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ার উপস্থিতি --- যা কোনভাবেই প্রেমের স্বপ্নমায়াজাল বিস্তারের অনুকূল নয়। কিন্তু বৈশাখী প্রভাতের স্নিগ্ধ মনোরম বাতাসের মত মধ্যদিনের উত্তপ্ত বাতাসও রবীন্দ্রভাবনায় প্রেমের বার্তাবহ হয়ে এসেছে। গ্রীষ্মের ব্যতিক্রমী মুহূর্তগুলির সঙ্গে তার চিরপরিচিত রূপটিকে কবি এই দুটি গানে একসূত্রে বেঁধেছেন।

দুটি গানে নৈসর্গিক পরিমণ্ডল জুড়ে স্বপ্নাবেশের সঞ্চার -- গ্রীষ্মের গানে যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এই দুটি গান বাদে আর একটিমাত্র গানেই "স্বপ্ন" শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। গানটি হল প্রকৃতি পর্যায়র **১৬** নং গানটি :

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।।
প্রান্তরপ্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের-**স্বপ্নাবেশে**-ধ্যানমগন-আঁখি---[৪]

কিন্তু এই স্বপ্নাবেশ সঞ্চারিত ধ্যানমগ্ন রুদ্রের চোখে--- যে রুদ্র অগ্নিময় গ্রীষ্মের ধ্যানমূর্তি। এই স্বপ্ন কোনভাবেই প্রেমিক মানবহৃদয়ের ভাবাবেশ নয়। সেই স্বপ্ন গ্রীষ্মের শুধুমাত্র এই দুটি গানেই আছে। আর দুটি গানেই স্বপ্নাবেশঘন মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে "বাতায়ন"। স্বপ্নাবেশবিহীন আর অন্য সব গ্রীষ্মসঙ্গীতে বাতায়নের রূপকল্পও অনুপস্থিত।

এই দুটি গানে প্রেমের স্মৃতি উদ্দীপনায় অনুঘটক বাতাস --- একটি গানে বৈশাখের ভোরের হাওয়া, অন্যটিতে মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়া। দ্বিতীয় গানে বাতাসের এই ভূমিকা প্রাথমিক পাঠেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম গানে অবশ্য এই ভূমিকা ততখানি স্পষ্ট নয়। ভোরের হাওয়া যে অদৃশ্য চরণের ছন্দ অথবা এলায়িত কেশদামের সুখস্পর্শ বহন করে আনে তা অতীতস্মৃতি হতে পারে আবার নাও পরে। তবে আভোগে চাঁপাবনের কাঁপনে নিশ্চিতভাবেই বাতাসের উপস্থিতি অনুভব করা যায়, এবং এই বাতাস অতীত কোন প্রভাতের স্মৃতিই বহন করে আনে। গ্রীষ্মের অন্য কোন গানে বাতাসের এমন স্মৃতি উদ্দীপক ভূমিকা দেখা যায় না। ১৪ নং গানে বৈশাখী বাতাসকে কবি স্মৃতিনাশক ভূমিকায় দেখতে চান ; সমস্ত পুরাতন স্মৃতিকে সে আবর্জনার মত দূরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ।।[৫]

গ্রীষ্মের অন্য আর যেসব গানে বাতাসের উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে সে শুধুই শরীর মনের দহনজ্বালার অনুষঙ্গবাহী।

প্রকৃতি পর্যায়ের একাধিক গানেই বাতাস হারানো দিনের বাণী বহন করে আনে। কিন্তু বাতাসের যে স্মৃতি-উদ্দীপক ভূমিকা আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় গানে দেখা যায় তা গানটিকে শুধু গ্রীষ্মসঙ্গীতের মধ্যেই নয়, সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি পর্যায়ের গানের মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে। বিভিন্ন ঋতুসঙ্গীতে বাতাসের এই ভূমিকার একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

প্রকৃতি পর্যায়ের একাধিক গানে বিধৃত হারানো দিনের উদ্দেশে অতীতচারী মানবহৃদয়ের অভিসারযাত্রার ধারাভাষ্য ; বহু ক্ষেত্রেই সেই স্বপ্নযাত্রাপথের দিশারী বর্ষার সজল বাতাস --- বাদল বাতাস, পূব হাওয়া বা যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন। কোন কোন গানে এই স্বপ্নযাত্রার অভিমুখ ব্যক্তিজীবনের কোন অতীত অধ্যায়, কখনও আবার এই কল্পপ্রত্যাবর্তন ঘটে ইতিহাসের কোন নামহীন পর্বে, কালান্তরে। প্রথম শ্রেণির গানের দৃষ্টান্ত :

আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে,
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগনতলে॥
সে দিন যে রাগিণী গেছে থেমে অতল বিরহে নেমে গেছে থেমে
আজি **পুবের হাওয়ায় হাওয়ায়** হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে॥[৬]

দ্বিতীয় শ্রেণির কোন কোন গানে দেখা যায় বাদল বাতাস যুগযুগান্তরের বেদনার বাণী বহন করে আনে

আজ আকাশের মনের কথা ঝরোঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।।
দিঘির কালো জলের 'পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে

বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে। [৭]

কখনও অতীতস্বপ্নবিভোর হৃদয় বাদল বাতাসের পথ ধরে প্রাচীন যুগের ছায়াসুনিবিড় অরণ্যতলে নাম না জানা সেই বিরহিণীর সন্ধান করে ফেরে :

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
সাথিহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্যছায়াতলে।।
কী জানি সেথা আছে কিনা আজও বিজনে বিরহী হিয়া
নীপবনগন্ধঘন অন্ধকারে---
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায়।।[৮]

কখনও বর্ষার গানে উদ্ভাসিত সেই অতীত সাহিত্যে কাব্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বপ্নময় প্রাচীন ভারত --- কালিদাসের কাল; যুগান্তরের সুরভিধারা বহন করে আনে বাদল বাতাস :

বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে॥
যে মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি **সজল সমীরণে**॥[৯]

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য "ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে" গানটি (প্রকৃতি /২৭) । এই গানে দ্বিতীয়,তৃতীয়, চতুর্থ স্তবক জুড়ে কালিদাসের যুগের ভারতের রূপকল্প।শেষ স্তবকটি এই আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাতাস এখানে বর্তমান বাস্তবতা ও স্বপ্নমেদুর অতীতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। বাস্তব বর্তমান মুহূর্তে দেখি "দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা" আবার সেই "মত্তমদির বাতাসে"ই শতেক যুগের কবিদল" মিলে রচনা করেন "শতেক যুগের গীতিকা"।

কখনও এই স্বপ্নাভিসার ইতিহাসের কোন সুনির্দিষ্ট পর্বের লক্ষ্যে নয়, এই যাত্রাশেষে মন উপনীত হয় সৃষ্টির উষালগ্নে, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় এক কালহারা কালে। দিশারী এখানেও পূব হাওয়া।

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে॥
(...)
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পুব-হাওয়া ধায় আকাশতলে, তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে॥ [১০]

বাতাসের এই স্মৃতি উদ্দীপক ভূমিকা প্রসঙ্গে বলতে হয় অতীত স্বপ্নে উত্তরণের সোপান প্রায় সবক্ষেত্রেই বাদল বাতাস। বসন্তবাতাসকেও এই ভূমিকায় দেখা যায় না। বসন্ত পবনে ভোলাদিনের কান্নাহাসির সুর বাজে না। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র বসন্তের একটি গান : পূর্বাচলের পানে তাকাই (প্রকৃতি / ২৫৯)। এই গানে যদিও সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি বসন্তবাতাসই অতীতস্মৃতি বহন করে আনছে, তবু যেহেতু গানটির পর্যায় বসন্ত, তাই গানে বিশেষণহীন বাতাসকে বসন্তবাতাস ভাবা ভুল হবে না।

মাঝে মাঝে কোন বাতাসে চেনা দিনের গন্ধ আসে
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধ-ভোলা সেই কান্নাহাসি।[১১]

বর্ষার সজল বাতাসের এমন বৈচিত্র্যময় ভূমিকা সত্ত্বেও একটি ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। বর্ষার গানে প্রত্যাবৃত্ত অতীত জীবনের এক নামহীন অধ্যায়, বাদল হাওয়া ব্যক্তিজীবনের কোন সুনির্দিষ্ট পর্বে (যেমন শৈশবে, কৈশোরে) প্রত্যাবর্তন ঘটায় না। আর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ভূমিকাই পালন করে গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়া। শুধু প্রকৃতি পর্যায়ের গানেই নয়, সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে কৈশোরের প্রেমের স্মৃতি বহন করে আনে কেবল গ্রীষ্মের এই তপ্ত বাতাস। বহু গানেই প্রেমের স্মৃতিচারণ আছে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কৈশোরের প্রেমের স্মৃতিচারণ শুধু এই একটি গানেই।[১২]

লক্ষণীয় অগ্নিবর্ষী বাতাস এই বিরহবেদনাকে জ্বালাময় করে তোলে না, উত্তপ্ত বাতাস স্বপ্নাবেশ সঞ্চার করে ; প্রাণের গভীরে অবরুদ্ধ নৈরাশ্য "উচ্ছ্বসিত" হয়ে ওঠে "মধুর নিশ্বাসে"। বেদনা মধুর হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে রয়েছে।[১৩] কিন্তু বেদনার এমন রূপান্তরে "তপ্ত হাওয়ার" ভূমিকা নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত।

রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মসঙ্গীতের মধ্যে আলোচ্য গানদুটির আর একটি স্বাতন্ত্র্য ফুলের রূপকল্পের ব্যবহারে। আমরা দেখেছি এই দুটি গানে আছে চাঁপা, বকুল ও বনযূথী। গ্রীষ্ম উপপর্যায়ের আর কোন গানে সুনির্দিষ্ট কোন ফুলের নাম পাওয়া যায় না। আর নামহীন ফুলের রূপকল্প এই উপপর্যায়ের যে সব গানে রয়েছে, সেখানে শুধুই শুকনো ফুল অথবা ঝরা ফুল। তেমন দৃষ্টান্তও শুধু তিনটি।

ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে প্রথম দৃষ্টান্ত " নাই রস নাই" (প্রকৃতি / ১০) :

শুষ্ক ধূলায় খসে পড়া ফুলদলে [১৪]

পরবর্তী উদাহরণ "প্রখর তপনতাপে" (প্রকৃতি / ১৮) :

এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার[১৫]

শেষ উদাহরণ "চক্ষে আমার তৃষ্ণা" (প্রকৃতি / ২৫) :

যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো [১৬]

আমাদের আলোচ্য গানদুটিতে গ্রীষ্মের নিষ্করুণ, রিক্ত রূপটি চিত্রায়ণের উদ্দেশ্যে ফুলের রূপকল্পের ব্যবহার হয় নি ; ফুলেরা আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল। তারা পটভূমি রচনা করছে না ; গানে অভিব্যক্ত আনন্দ বেদনা সঞ্চারে তাদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। যূথী ও বকুলের ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে হয়, যে সব গানে নির্দিষ্ট কোন ফুলের গন্ধের উপস্থিতি রয়েছে, তাদের মধ্যে এই দুটি ফুলের প্রয়োগই সর্বাধিক : যূথী ও বকুলের সৌরভ যথাক্রমে আটটি ও সাতটি গানে।[১৭] কিন্তু পুষ্পসৌরভমাধুর্যের লেশমাত্র গ্রীষ্মের অন্য কোন গানে মেলে না।

প্রেমের নৈসর্গিক পটভূমি সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণা রবীন্দ্রনাথ এই দুটি গানে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা:

১) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রীষ্মসঙ্গীত : ওই বুঝি কালবৈশাখী (প্রকৃতি /১৭)। গানটির রচনাকাল বৈশাখ, ১৩২৬, (১৯১৯)
২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৩৪
৩) তদেব, পৃ ৪৩৬
৪) তদেব, পৃ ৪৩৩
৫) তদেব, পৃ ৪৩২
৬) তদেব, পৃ ৪৭৯
৭) তদেব, পৃ ৪৫৪
৮) তদেব, পৃ ৩৭৮
৯) তদেব, পৃ ৪৫৫

১০) তদেব, পৃ ৪৫০

১১) তদেব, পৃ ৫২৯

১২) "কৈশোর" শব্দটির প্রয়োগ এই গানটি ছাড়া আর একটিমাত্র গানেই দেখা যায় : "ওরা অকারণে চঞ্চল" (প্রকৃতি /২৪৪)। কিন্তু এখানেও বর্ণনীয় বিষয় কৈশোরের প্রেম নয় : "মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে কৈশোরকোলাহল"। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলা কৈশোরের প্রেমের স্মৃতিচারণরূপে আমাদের আলোচ্য গানটি
অনন্য।

১৩) গায়ে আমার পুলক লাগে (পূজা /৩১৮) : বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর ; নয়ন ছেড়ে গেলে চলে (পূজা/৩৮৫) তোমার : সুধারসের ধারা গহনপথে এসে **/ব্যথারে মোর মধুর করে** নয়নে যায় ভেসে (; **বিরহ মধুর হল** আজি (প্রেম / ২৬২) ; ব্যাকুল বকুলের ফুলে (প্রকৃতি/৯)) **বেদনা সুমধুর হয়ে** ভুবনে আজি গেল বয়ে (; আমার যেদিন ভেসে গেছে (প্রকৃতি/১৩৬) নিবিড় সুখে : **মধুর দুখে** জড়িত ছিল সেই দিন(; এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে (প্রকৃতি /২২৩) :তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি **মধুর বেদনভরে**(যেন আমায় স্মরণ করে /

১৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৩১

১৫) তদেব, পৃ ৪৩৪

১৬) তদেব, পৃ ৪৩৬-৪৩৭

১৭) যূথীগন্ধের উপস্থিতি এই আটটি গানে : এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন (পূজা/ ৫৬৮), বাজে করুণ সুরে (প্রেম/ ১৯৭), মনে কি দ্বিধা (প্রেম / ২৭৭), মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে (প্রকৃতি / ২৩), এই শ্রাবণবেলা (প্রকৃতি/ ৪৪), ওরে ঝড় নেমে আয় (প্রকৃতি /৫৯), আমি তখন ছিলেম মগন (প্রকৃতি/১০৫), এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও (প্রকৃতি / ১২৮)।
বকুলগন্ধের উপস্থিতি এই সাতিটি গানে : মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি (প্রেম/ ১৩৮), বলো সখী, বলো (প্রেম/২১৭), আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ (প্রেম / ২২২), বকুলগন্ধে বন্যা এল (প্রেম/ ২৩৮), ফাগুনের নবীন আনন্দে (প্রেম/ ২৪৫), ধরা সে যে দেয় নাই (শ্যামা /দ্বিতীয় দৃশ্য), দূর আকাশের নেশায় মাতাল (নাট্যগীতি / ১২৭)
মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : রবীন্দ্রসঙ্গীতে উদ্ভিদ ও ফুল, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ ৪১-৪৩,
৮০-৮৫)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
বিশ্বাস, অপূর্ব : ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬
মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : রবীন্দ্রসঙ্গীতে উদ্ভিদ ও ফুল, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৯
রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, আশা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮০
সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি, গানের ঝরনাতলায়, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩
সর্বাধিকারী, কেতকী : রবির আলোয় ঋতুদের শোভাযাত্রা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৪
সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৮২